আজকের কাগজ
২৪
তারিখ 11 AUG 1991
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৬
(১১)

বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাস নিরসন, একটি ভিন্ন প্রস্তাব

নজরুল ইসলাম চৌধুরী

নিশ্চয়ই এমন কোন যাদুর কাঠির সন্ধান আমাদের জানা নেই, যা দিয়ে স্পর্শ করলেই শিক্ষাঙ্গন শান্ত হয়ে যাবে। ভেতো বাঙালী ভীতু বাঙালীর বদনাম ঘুচিয়ে আজ আমাদের ঘরে যে সন্তানদের আবির্ভাব ঘটেছে, তারা সবাই সিংহ শাবক। এক লহমায় এক জনের ঘাড়ে আরেকজন লাফিয়ে পড়তে কোন দ্বিধা নেই, নেই কোন অপরাধবোধ, সবই যেন একটা খেলা আর কি। প্রবীণরা বিস্ময়ে বিমূঢ় হন আর ভাবেন, ছেলেরা এমন হল কেন? একটু ভাবলে উত্তর খুঁজে পাওয়া যায়। পরিবেশগত একটা স্বাভাবিক পরিণতি এটা, চাওয়া পাওয়ার আকাশ পাতাল ফারাক থেকে সৃষ্ট অসামঞ্জস্যতার বিষফল মাত্র। সন্ত্রাস বিশ্ববিদ্যালয়ে, মহাবিদ্যালয়ে, মহাসড়কে, হাটে বাজারে গঞ্জে। এদেশে কোন সরকার ছিলেন কিনা বা বর্তমানে আছেন কিনা, এ রকম প্রশ্ন যদি কেউ করে বসে, তা হলে তাকে সাধুবাদ জানানো খুব অন্যায় হবে কি?

ক্ষুদ্র পরিসরের এই আলোচনায় সন্ত্রাসের ক্ষেত্রকে আপাততঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে সীমাবদ্ধ রাখতে চাই। দেশে সাত শতাধিক কলেজ আছে। সেখানে সন্ত্রাসও আছে। তবে বড় কয়েকটি কলেজের কথা বাদ দিলে ওগুলোর সন্ত্রাস বিশ্ববিদ্যালয়ের মাপের হয় না। আর যদি কোন দিন বিশ্ববিদ্যালয় সন্ত্রাসমুক্ত হয়ে যায় তাহলে কলেজসমূহও শান্ত হয়ে যাবে স্বাভাবিক পরিণতি হিসাবে।

বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের এই সন্ত্রাসী পরিণতির অনেক কারণ থাকতে পারে। তবে মূলকারণ সম্ভবতঃ একটাই এবং সেটা হচ্ছে– ক্যাপাসিটির চাইতে কয়েকগুণ বেশী ছাত্রের অবস্থিতি। এখন তিন বছরের অনার্স কোর্স পাস করতে সময় লাগে ছয় বছর। জট ভাঙছে না, পুরনো জট নতুন জটের সৃষ্টি করছে। এক একটা ইয়ারে আছে তিন চারটা ব্যাচ। স্বাভাবিক অবস্থায় যেখানে ছাত্র সংখ্যা পাঁচ ছয় হাজার হওয়ার কথা ছিল, সেখানে আছে আঠার বিশ হাজার। একটি সংক্ষিপ্ত পরিসরে সবাইকে জড়ো করালে বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থা দেখা যেত ঈদের মৌসুমের সদরঘাটের লঞ্চের মত, ডুবে যাবার শতকরা নব্বুই ভাগ সম্ভাবনা। কোন্ বিশ্ববিদ্যালয়ে আবাসিক হল কয়টা আছে, তাদের সিট সংখ্যা কত? দেশের দূর দূরান্ত থেকে যারা পড়তে আসে, বিশ্ববিদ্যালয় যাদের ভর্তি করে তাদের আবাসনের ব্যবস্থাটা কি? তাই সিটের লড়াইটা হল–সমূহের সন্ত্রাসের মৌল উপাদান। ভর্তি হয়েই ছেলেরা শুরু করে সিটের তদবির। পুরনো মুরব্বীদের সহায়তায় শুরু হয় সিট দখলের প্রচেষ্টা, কৌশল, গায়ের জোর প্রয়োগ। তা থেকে শুরু হয় ব্যক্তি পর্যায়ের সংঘাত, পরে দলীয় হস্তক্ষেপ এবং পরিশেষে যুদ্ধ। এখানে রাজনীতি থেকে ব্যক্তি সংঘাত না এসে সংঘাত আসছে, সংক্রমিত হচ্ছে, ব্যক্তি থেকে রাজনৈতিক পর্যায়ে। এর চেয়ে দুঃখজনক আর কি হতে পারে? আমরা ছাত্র নেব, তার প্রাপ্য সুবিধা দেব না। একজন আট দশ বছর ধরে সিট নিয়ে বসে থাকবে আর একজন চার বছর ধরে একটা সিটের জন্যে হাপিত্যেশ করবে– এই অবস্থায় সিটের লড়াই যদি অবশ্যম্ভাবী হয়ে দেখা দেয়, তা হলে দোষ দেব ওদের? আর দলীয় রাজনীতির ভূমিকা? – এটা অত্যন্ত সহজ ফর্মূলাঃ যে হলে যে দলের কর্মী সমর্থক বেশী থাকবে সেখানে সে দলই হবে ক্ষমতাসীন। তাইতো যুদ্ধ আজকাল ময়দানে দুই দলের মাঝে না হয়ে দুই হল থেকে হয়। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্ত্রাস নিরসনের প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে এখন থেকে যে ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন সেটা হচ্ছে, ছাত্র সংখ্যা একটা নিরাপদ সীমার ভিতরে নিয়ে আসা, যাতে আবাসন সমস্যার উদ্ভব না ঘটে। প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমান ছাত্র সংখ্যার অনুপাতে শিক্ষক সংখ্যাও কম, ক্লাস রুমের সংখ্যাও কম। আর দশ বিশ হাজার ছাত্রের জন্য যে লাইব্রেরী সার্ভিসের দরকার, তার এক দশমাংশ নেই। এ অবস্থায় ছাত্র সংখ্যা কমানো ছাড়া আর কোন দ্বিতীয় উপায় আছে বলে মনে হয় না।

যদি সরকারী পর্যায়ে এ প্রশ্নটা উত্থাপন করা হয়, তা হলে আমাদের সরকার বাহাদুর নিশ্চয়ই একটা ঐতিহ্যগত ব্যবস্থার দিকে অগ্রসর হবেন। তারা জানেন কিছু একটা করতে হলে একটা কমিশন বসাতে হয়। সরকারের হাতে সব সময়ই কিছু বেতনভুক বিশেষজ্ঞ, কিছু টেকনোক্র্যাট থাকেন যারা আলু মূলার চাষ থেকে শুরু করে পৃথিবীর সব কঠিন কঠিন বিষয়ের উপর গভীর জ্ঞান ধারণ করেন। তারাই হবেন কমিশনের মাননীয় সদস্য এবং অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে তারা রিপোর্ট দেবেন– যে রিপোর্টের সারবত্তা কোন দিনই সরকারের বোধগম্য হবে না। আয়ুব খানের মৌসুমী বন্যা কমিশনের মতো তিন মৌসুমে এটাও গায়েব হয়ে যাবে। তাই আমার প্রস্তাব সরকারের নিকট নয়, সরাসরি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমাজের নিকট। আমি যে প্রস্তাব দিচ্ছি এটা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিল ও সিনেটের ব্যাপার। প্রয়োজনীয় আইন সংশোধন বা নতুন আইন প্রণয়নের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ই যথেষ্ট। প্রকৃতপক্ষে এটা বিশ্ববিদ্যালয়ের একান্ত এখতিয়ারভুক্ত। সরকারের হস্তক্ষেপ করার কিছু নেই।

প্রস্তাব

(১) বিশ্ববিদ্যালয় হতে অনার্স শ্রেণী উঠিয়ে দিতে হবে। দেশের সব ডিগ্রী কলেজে অনার্স চালু করতে হবে।

(২) অনার্স কোর্স হবে দুই বছরের এবং সিলেবাস হবে বর্তমান পাস কোর্সের সিলেবাস।

(৩) স্নাতক পাস কোর্স বলে কিছু থাকবে না।

(৪) যে ছাত্র ফাইন্যাল পরীক্ষায় কোনো বিষয়ে ৬০% নম্বর পাবে, সে সেই বিষয়ে অনার্স পাবে। এ ভাবে একজন প্রকৃত মেধাবী ছাত্র ডবল অনার্স ট্রিপল অনার্স এবং সকল বিষয়ে ৬০% নম্বর পেলে ডিসটিংশন লাভ করবে।

(৫) যারা কোনো বিষয়ে ৬০% নম্বর পাবে না, তারাই পাবে স্নাতক পাস সার্টিফিকেট,– দ্বিতীয়, তৃতীয় বিভাগ।

(৬) বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকবে প্রকৃত উচ্চ শিক্ষা,– মাস্টার্স এবং রিসার্চ। স্নাতক পরীক্ষায় যারা অনার্স পাবে তারাই সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মাস্টার করার অগ্রাধিকার পাবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিত শিক্ষকবৃন্দের হাতে ওদের হবে প্রকৃত উচ্চ শিক্ষা। হলের সিট কিংবা লাইব্রেরীর সুযোগ ওদের জন্য থাকবে পর্যাপ্ত এবং পরীক্ষা বছরে একবারে না নিয়ে উন্নত বিশ্বের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মতো বছরে একাধিক পরীক্ষা নিতে হবে, যাতে করে সার্টিফিকেট জোগাড়ের সাথে ওরা জ্ঞানও নিয়ে আসতে পারে।

উপরোক্ত প্রস্তাবের দোষগুণ বিচার আমার হাতে নয়। তবু নির্দ্বিধায় যা বলতে পারি– তা হল, বিশ্ববিদ্যালয় হতে অনার্সের ভার কমিয়ে ফেললে ওখানে যে ছাত্র গ্রাজুয়েট এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সচেতন, ওরা রাজনৈতিক আন্দোলনে নামলে সেটা আত্ম ধ্বংসকারী হবে না। তরুণ মনের চপলতা ওই বয়সে কমে এসে বিচার বুদ্ধি বাড়তে থাকে। তা ছাড়া একটা ডিগ্রীর জন্য তরুণদের যৌবন অতিক্রান্ত করতে হবে না। সবচে' বড় উপকার হবে গরীব দেশবাসীর। ছেলেমেয়ের জন্য অতিরিক্ত দু'চার বছরের খরচ যোগান দিতে হবে না এবং তারো চেয়ে বড়— কখন গুলির তলে ওরা মারা যাচ্ছে এ দুশ্চিন্তায় উদ্বিগ্ন থাকতে হবে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র–ছাত্রীর সাথে শিক্ষকদের জীবনেও আসবে শান্তি। সরকারের পক্ষে চাকরির বয়স বাড়ানোর দরকার পড়বে না আবার।

এ প্রস্তাবের বিপক্ষে হয়ত অনেক কিছুই বলা যায়। যেমন একজন শিক্ষক বলেছিলেন, অনার্স কোর্স বিশ্ববিদ্যালয়ে না থাকলে ভার্সিটির গ্লামারই থাকবে না। এ কথার উত্তর আমি খুঁজে পাইনি, প্রয়োজনও বোধ করিনি। তিন বছরের বদলে দুই বছরের কোর্স দিয়ে পড়াশোনা কতদূর হবে এ প্রশ্নও এসেছে। আমার উত্তর, এক বছর এদিকে কমে গেলে মাস্টার্সেতো একবছর বেড়ে যাবে, ঘাটতি হল কোথায়? ভারতেই তো এরকম ব্যবস্থা আছে। কলেজেই পড়ানো হয় অনার্স, মাস্টার্স বিশ্ববিদ্যালয়ে। কৈ ওদের তো বিদ্যার, জ্ঞানের ঘাটতি নেই। আসলে জ্ঞানার্জন বছরের মাপে হয় না। এরজন্য প্রচেষ্টা ও পরিশ্রমই আসল। প্রায় তিন দশকের শিক্ষকতার জীবনে বহু সেকেন্ড ক্লাস অনার্সসহ সেকেন্ড ক্লাস মাস্টার্স ডিগ্রীধারী ছেলেমেয়ের ইন্টারভিউ নিয়েছি। সার্টিফিকেট দেখেছি ঠিকই, কিন্তু বিদ্যার বহর দেখে মাঝে মাঝে নিজেই লজ্জাবোধ করেছি। বেসিক নলেজ বলতে অনেকেরই কিছু নেই, শুধু নোট মুখস্থের পাস। এটাকে উচ্চ শিক্ষা বলাই চলে না। আর প্রকৃতপক্ষে বছরের মাঝে অনার্স বা সম্মান না হয়ে এটা জ্ঞানের মাপে হওয়া উচিত, পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের মাঝে হওয়া উচিত।

পরিশেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্ঞানী শিক্ষকবৃন্দের উদ্দেশে বলব, পুরোনো রীতি সময়ের দাবিতে সংশোধনের নামই বোধ হয় প্রগতি। আমরা ওই পথে একটা পদক্ষেপ এখনই নিতে পারি। আগামী বছরের বিশ্ববিদ্যালয় অনেক অবাঞ্ছিত উপদ্রব থেকে মুক্ত হয়ে জ্ঞানচর্চার পরিবেশ ফিরে পাবে, এটা আমারও আন্তরিক বিশ্বাস।

নজরুল ইসলাম চৌধুরীঃ প্রফেসর ও অধ্যক্ষ, মদনমোহন কলেজ, সিলেট।